২০০০–২৩

প্রত্যাশা হতাশা দিশা

টিম মার্কসবাদী পথ

e-book

২০০০–২৬

প্রত্যাশা
হতাশা
দিশা

প্রত্যাশা হতাশা দিশা

২০০০–২৬

টিম মার্কসবাদী পথ

2000–26
Pratyasha Hatasha Disha

by Team Marxbadi Path

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০২৬

প্রকাশক
শান্তনু দে
মার্কসবাদী পথ
৩১, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬
marxbadipath.org
marxbadipath.22@gmail.com

সংকলন
উর্বা, শিঞ্জিনী, শমীক, অনল

প্রচ্ছদ ও গ্রন্থসজ্জা
তর্পণ

CC BY

e-book বিনামূল্যে বিতরণের জন্য বিশেষ ই-বুক

সূচি

ভূমিকা	৬
প্রত্যাশা	৯
হতাশা	২৯
আশা	৪২

ভূমিকা

সাল ২০০০। শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাংলা। আড়াই দশকের পথে বামফ্রন্ট। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

বাংলায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি পর্যায় প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ভূমি সংস্কার, অপারেশন বর্গা থেকে পঞ্চায়েত। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। গরিবের হাতে জমি। গরিবের হাতে সরকার। সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত। কৃষি থেকে উৎপাদন ও উদ্বৃত্তের এক অসাধারণ বৃদ্ধি। যা গ্রামের যুবকদের কৃষিজমিতে নির্ভর করার বাধ্যবাধকথা থেকে মুক্ত করে।

সাফল্য বরাবরই কিছু নতুন চ্যালেঞ্জের জন্ম দেয়। এবং দিয়েছিল-ও। গ্রাম-শহরের শিক্ষিত তরুণরা ট্র্যাডিশানাল কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন না। থাকার কথাও নয়। স্বাভাবিক। গ্রামের কৃষক পরিবারের শিক্ষিত তরুণ প্রজন্ম কেন জমিতে ফিরবে? রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশ তাদের চাহিদা মতো কাজ দিতে পারছে না। বাংলার যুবসমাজ, যারা তুলনামূলকভাবে শিক্ষায় এগিয়ে, তাদের

জন্য কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করাই ছিল তখন চ্যালেঞ্জ। সঙ্গে দেশে উদারনীতি। ২০০৮ থেকে বিশ্বায়িত অর্থনৈতিক সংকট। রাজ্যে কৃষির সাফল্যকে সংহত করে শিল্পায়নের ভিত গড়ে তোলা— ছিল সময়ের দাবি, সময়ের চাহিদা। কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ— শুধু নিছক একটি স্লোগান ছিল না— ছিল প্রত্যাশা আর একবুক স্বপ্ন।

বিপরীতে, ওয়াশিংটনের ব্লু-প্রিন্টে উগ্র দক্ষিণ, মধ্য-দক্ষিণ থেকে অতি বাম, মাওবাদীরা— সবাই ছিল একজোট। সকলের নিশানায় ছিল বামফ্রন্ট। ২০১১, হতাশা আর স্বপ্নভঙ্গের শুরু। কারো শব্দবন্ধে 'প্রতিবিপ্লব', কারো ভাষ্যে আরেকটি 'কালার রেভেলিউশন'।

পরবর্তী দেড়দশক। আজ খাদের কিনারে বাংলা। আজকের বাংলার রাজনীতি মানে, বিজেপি-র হিন্দুত্বের রাজনীতির পালটা তৃণমূলের হিন্দুয়ানি রাজনীতি। কর্মসংস্থান নয়। ইস্যু ধর্মস্থান। মন্দির-মসজিদের রাজনীতি। কে বলবে রামমন্দির রাজনীতিকে প্রতিহত করার পন্থা দশটা জগন্নাথ মন্দির বা মহাকাল মন্দির তৈরি করা নয়!

রক্তশূন্য গ্রাম। মাইক্রোফিনান্সের মৃত্যুফাঁদে। কাজের খোঁজে গ্রাম উজাড় করে ভিন রাজ্যে যাওয়ার স্রোত। কামদুনি, হাসখালি থেকে অভয়া। নেই মেয়েদের নিরাপত্তা। শহরে-গ্রামে— নেই কোথাও। ভেঙে পড়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো। নেই নতুন শিল্প। নতুন কলকারখানা। উলটে বন্ধ হচ্ছে চালু কারখানা। থিকথিক করছে শিক্ষিত বেকার। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকারি দপ্তর— কোথাও নিয়োগ নেই।

এক নৈরাজ্যের রাজ্য। পুলিশ-স্টেট। উর্দির আড়ালে প্রকৃত চেহারা। পুলিশ প্রশাসনে তৃণমূলের দলীয়করণ। নিচ থেকে ওপর— সর্বত্র। ফ্র্যাঞ্চাইজি অর্থনীতির সেবাদাস।

এখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। বাংলার জন্য। বাংলার ভবিষ্যতের জন্য। বামপন্থীরা হেরেছে ঠিকই। কিন্তু হারিয়ে যাইনি। জরুরি তাই রেজিসটেন্স। প্রতিরোধ। একইসঙ্গে একটি জোরালো কামব্যাক। বামপন্থার দুরন্ত প্রত্যাবর্তন। এই বাংলাকে বাঁচাতে হবে। বাঁচাতেই হবে। ওরা চায় বিভাজন। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ। বাংলা চায়, সকলের জন্য উন্নয়ন। সকলে মিলে উন্নয়ন।

আজকের দিশা: বাংলার পুনরুত্থান। বাম বিকল্পের মূল কথাও তাই: রিসারজেন্স অব বেঙ্গল।

সেই লক্ষ্যেই এই ই-বুক। টিম মার্কসবাদী পথ-এর একটি ক্ষুদ্র বিনম্র প্রয়াস। বলা যেতে পারে একটি খসড়া দলিল। খসড়া একারণেই, বিকল্পের ইশতেহার এখন চূড়ান্ত নয়। মানুষের মতামতে তা চূড়ান্ত হবে। তবু এই শতকের গত আড়াই দশক-কে এক ক্যানভাসে ধরার একটি আন্তরিক চেষ্টা। কোথায় ছিলাম, এখন কোথায়, কোথায় যেতে হবে— এই নিয়েই এই বই। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে একাজ করার জন্য থাকতে পারে কিছু খামতি। থেকে যেতে পারে কিছু ভুল-ত্রুটি। যে কোনও গঠনমূলক সমালোচনা-প্রস্তাবকে তাই স্বাগত। তা আমাদের সমৃদ্ধ করবে। সমৃদ্ধ করবে বাংলার পুনরুত্থানের প্রত্যয়কে। সমৃদ্ধ করবে বাংলার দিশা-কে।

— টিম মার্কসবাদী পথ

পতাকা

১৯৭৭, পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হয় বামফ্রন্ট সরকার। সে সময় রাজ্যে ৭৩ শতাংশ গ্রামবাসী ছিলেন দারিদ্র্যরেখার নিচে। অনুপাতটি তৎকালীন সর্বভারতীয় দারিদ্র্যরেখার বিস্তৃতির তুলনায় (৫৬ শতাংশ) অনেক বেশি। আবার গ্রাম এবং শহর একত্র করে ধরলে সে-সময়ে পশ্চিমবঙ্গে ৬৭ শতাংশ পরিবারের অবস্থান ছিল দারিদ্র্যরেখার নিচে। সেখানে সর্বভারতীয় গড় অনুপাত ছিল ৫৪ শতাংশ। রাজ্যে সাক্ষরতার হার তখন ৩৩.২ শতাংশ। শিশুমৃত্যুর হার হাজার প্রতি ৯৫ জন।

নব্বইয়ের দশকের মধ্যেই বামফ্রন্ট সরকার দারিদ্র্যরেখার নিচে থাকা পরিবারের অনুপাত সর্বভারতীয় গড়ের কাছাকাছি নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। সাক্ষরতার হার টেনে তোলে ৮০ শতাংশের কাছাকাছি, শিশুমৃত্যুর হার নামিয়ে আনে প্রতি হাজারে ৩৮-এ, যেখানে ছিল ৯৫।

একেবারে গোড়া থেকেই পশ্চিমবঙ্গে একটি সমতামুখী, সমৃদ্ধতর সমাজ গড়ে তোলার পথে রাজ্যের বাম সরকার বেশকিছু কঠিন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিল:

- একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক-আধা-পুঁজিবাদী সমাজকাঠামোকে ধারণ করে দাঁড়িয়েছিল এই রাজ্য। ফলে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে বামফ্রন্ট সরকারকে বার বার মতাদর্শগত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়েছে।

- শ্রেণিবিভাজনের পাশাপাশি ছিল ধর্ম, জাত-পাত ও জনগোষ্ঠী কেন্দ্রিক নানা রকমের বিভাজনের বাস্তবতা।

- পশ্চিমবঙ্গের উদ্ভব দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে। ফলে অন্য প্রদেশ ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে এ-রাজ্যে নিয়মিত অভিবাসনের দায়িত্ব বহন করতে হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারকে। রাজ্যের যা পরিকাঠামো তার মধ্যে এই অভিবাসন খোঁজা মানুষের স্থানসংকুলান করানো ছিল একটা মস্ত বড়ো চ্যালেঞ্জ।

- চতুর্থ প্রতিবন্ধকতা ছিল স্বাধীনতা-উত্তর যুগে পশ্চিমবঙ্গের নিট বিনিয়োগ ক্রমশ কমে আসা। শিল্প কাঠামো যা ছিল তা এসে পড়েছিল ক্রমশ ধ্বংসের মুখে। বাতিল হয়ে যাওয়া টেকনোলজি, বাতিল হয়ে যাওয়া যন্ত্রপাতি, বাতিল হয়ে যাওয়া পরিকাঠামো— পশ্চিমবঙ্গ দাঁড়িয়েছিল এসবের উপরেই। বামফ্রন্ট সরকারকে গড়তে হয়েছিলনতুন পরিকাঠামো, আনতে হয়েছিল পেট্রো কেমিক্যালের মতো নতুন শিল্প, গড়তে হয়েছিল নতুন শহর, যেখানে নতুন টেকনোলোজির কম্পিউটার সফ্টওয়্যার ও হার্ডওয়্যার ভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠতে পারত। এ-রাজ্যের বিপুল বিদ্যুৎ ঘাটতিরও মোকাবিলা করেছিল বামফ্রন্ট সরকার।

- সংবিধান অনুসারে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরির দায় আছে রাজ্য সরকারগুলির, অন্যদিকে কর আদায়ের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারগুলি— ব্যাংক এবং টাকার বাজার, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বিদেশি বিনিয়োগ সবগুলিই আছে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। তাই কেন্দ্র-

রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের দাবি তুলেছিল বামফ্রন্ট সরকার।

- ভূমিসংস্কারে কেন্দ্রীয় সরকার সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা এবং শিল্পায়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে উদ্যোগগুলি ছিল সেগুলিতে অন্তরায় সৃষ্টি করা।

- কংগ্রেস আমলের শেষদিকে রাজ্যের শিল্পের হাল খুবই খারাপ জায়গায় পৌঁছোয়। ষাট এবং সত্তর দশকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সারা দেশের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে চিরাচরিত শিল্প বেশি থাকার ফলে নতুন প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের ধাক্কাও পড়ে বেশি।

- লাইসেন্স প্রথা ও মাসুল সমীকরণের নেতিবাচক প্রভাবের শিকার হয়েছে পূর্ব ভারত, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ। নয়া উদারনীতি চালু হওয়ার পরে একদিকে যেমন এর থেকে খানিকটা রেহাই পাওয়া যায় অন্যদিকে তেমনই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে শিল্প গঠন কার্যত গোটা দেশেই বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রেক্ষাপটেই ১৯৯৪-তে বামফ্রন্ট সরকার নতুন শিল্পনীতি গ্রহণ করে।

- বেসরকারি ক্ষেত্রের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে শিল্প গঠনের প্রক্রিয়া নতুন করে গতি পায়। সময় লাগে। কিন্তু ২০০০ সালের পর থেকেই ধীরে ধীরে রাজ্যে পুঁজির বিনিয়োগ হতে থাকে। বামফ্রন্ট সরকারই রাজ্যে শিল্পে মরুভূমি কাটিয়ে তোলে। এবং শিল্পে বিনিয়োগ ও শিল্প প্রকল্প বাস্তবায়নে দেশের সামনের সারিতে চলে আসে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে রাজ্য যেমন এক নম্বরে চলে আসে, তেমনই কর্মসংস্থান ও শিল্পবিকাশের কারণেই বড়ো শিল্পের

প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই উদ্যোগ যেমন সফলও হয়েছে, তেমনই কিছু ক্ষেত্রে তা গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যাও তৈরি করেছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও আরও নানারকমের প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করে এ-রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার উদ্যোগী হয়ে যে-সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল সেগুলোর মধ্যে লুকিয়ে ছিল একটি সমতামুখী উন্নয়নের সম্ভাবনা। উপযুক্ত সরকারি উদ্যোগের সাহায্যে সেগুলিকে যত বেশি সবল করা হয়েছে, তত বেশি এই অর্থনীতিটি একটি বিকল্প জনবাদী অর্থনীতি হিসেবে গড়ে উঠেছে। জনমুখী কর্মসূচির মধ্য দিয়েই কমিউনিস্ট কর্মীরা মেহনতি মানুষের সমর্থন অর্জন করেছেন।

ভূমিসংস্কার ও জমির অধিকার

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক কৃষি সম্পর্ক এবং ভূমিসংস্কার নিয়ে জাতীয় স্তরে কমিটি গড়ে তোলে ২০০৮ সালে। ২০০৯ সালে ইউপিএ-২ সরকারের সময়কালে সেই রিপোর্ট প্রকাশ করে কেন্দ্র। কমিটি বলেছিল, সারা দেশে বিকল্প তিনটি রাজ্য: পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরা।

- পশ্চিমবঙ্গে ৩০ লক্ষাধিক কৃষক পেয়েছেন ১১ লক্ষ ২৭ হাজার একরেরও বেশি জমি। সারা দেশে জমির পরিমাণের মাত্র ৩ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে। অথচ গোটা দেশে ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে যত জমি বণ্টিত হয়েছে তার ২২ শতাংশই আমাদের রাজ্যে। পাট্টা প্রাপকদের প্রায় ৩৭ শতাংশ তফসিলী জাতিভুক্ত, প্রায় ১৮ শতাংশ আদিবাসী, প্রায় ১৮ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের।

- রাজ্যে ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে নারী-পুরুষ যৌথ পাট্টা ৬ লক্ষ ১৮ হাজারেরও বেশি। মহিলাদের পাট্টা ১ লক্ষ ৬১ হাজারেরও বেশি। বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কারের ফলে রাজ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের হাতে ছিল ৮৪ শতাংশ কৃষিজমির কার্যকরী মালিকানা। জাতীয় স্তরে এই হার ৩৪ শতাংশের অল্প বেশি। ২০১১ সালে রাজ্যে বর্গা নথিভুক্ত জমির পরিমাণ প্রায় ১১ লক্ষ ১৫ হাজার একর।

- শুধুমাত্র ২০০৬-২০১০ সালের মধ্যেই ১৬ হাজার ৭০০ একর জমির পাট্টা বিলি করা হয়েছিল। ২০১০-১১ সালে বিলি করা হয়েছে আরও ৬ হাজার একর। সাড়ে চার বছরে যত জমি পশ্চিমবঙ্গে বিলি হয়েছে, তা অন্যত্র কুড়ি বছরেও হয়েছে কিনা সন্দেহ।

- ভূমিসংস্কারের কাজ আরও সংহত করতে **চাষ ও বসবাসের ভূমিদান** প্রকল্প কার্যকর করেছিল সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার-ই। দেশের প্রথম এরকম উদ্যোগ। খেতমজুর, গ্রামীণ কারিগর ও মৎস্যজীবীদের ৫ কাঠা পর্যন্ত জমি দেওয়া হয়েছে বিনামূল্যে। ইচ্ছুক জমি মালিকদের কাছ থেকে সরকার বাজারদরের চেয়ে ২৫শতাংশ বেশি দাম দিয়ে জমি কিনেছিল। প্রায় ২ লক্ষ পরিবার এই প্রকল্পে উপকৃত হয়েছিলেন।

- **বনাধিকার আইন** ২০০৬ অনুযায়ী প্রায় ২৭ হাজার আদিবাসী পরিবার পাট্টা পেয়েছেন।

- ২০০৬-২০১১ সালের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার শহরের গরিব মানুষদেরও বসবাসের জমির নিশ্চয়তা দিয়েছে। উদ্বাস্তুরা পেয়েছিলেন নিঃশর্ত জমির স্বত্ব। উদ্বাস্তু নয় কিন্তু

উদ্বাস্তু জমিতে বসবাসকারী মানুষেরাও পেয়েছিলেন জমির দীর্ঘমেয়াদী লিজ স্বত্ব। ২০ বছরের বেশি সময় ধরে সরকারি অব্যবহৃত খাস জমিতে বসবাসকারী শহরের গরিব মানুষ পেয়েছিলেন মাত্র ১ টাকায় ৯৯ বছরের দীর্ঘমেয়াদী লিজ। শহরের গরিব মানুষরা যাতে নিরাপদে বসবাসের অধিকার পান সেই জন্যে সংস্কার করা হয়েছিল **ঠিকা প্রজাস্বত্ব আইন**।

কৃষিফসল ও খাদ্য উৎপাদন

ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে কৃষকের স্বার্থরক্ষার ফলেই কৃষি উৎপাদনে সাফল্য এসেছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কৃষিতে বৃদ্ধির হার ২০০৮-০৯ সালে ছিল ১.৬ শতাংশ। ২০০৯-১০ সালে ০.২ শতাংশ। যেখানে পশ্চিমবঙ্গে ২০০৮-০৯ সালে ৪.৪ শতাংশ। ২০০৯-১০ সালে ৪.২শতাংশ।

ভারতে নয়া উদারনৈতিক বিশ্বায়নের নীতির ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমে যায়। পশ্চিমবঙ্গে, একটি অঙ্গরাজ্যে তার ব্যতিক্রম হয়নি (১৯৯০-৯৫ পর্বে ২.১৩ শতাংশ বৃদ্ধি), হওয়ার কথাও নয়। তবু, এর মধ্যেও ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০৪-০৫ সাল পর্যন্ত সময়ে পশ্চিমবঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ছিল ২.৬৭ শতাংশ। সারাদেশে রাজ্যগুলির মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হারে পশ্চিমবঙ্গ ছিল তৃতীয় স্থানে। ঐ একই সময়ে কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির জাতীয় গড় ছিল ১.৮৫ শতাংশ।

এই তীব্র কৃষি সংকটের ফলে বিভিন্ন রাজ্যে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটতে থাকে, বিশেষত অন্ধ্র প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রে। পশ্চিমবঙ্গ এই তীব্র দুর্দশার প্রবণতা থেকে ছিল অনেকাংশে মুক্ত। সারা দেশে কৃষিতে এইরকম হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গে

কৃষিতে বৃদ্ধির হার ছিল জাতীয় গড়ের থেকে বেশি। ২০০৯-১০ সালেও সারা দেশে কৃষি বৃদ্ধির গড় হার যেখানে ০.২ শতাংশ ছিল, পশ্চিমবঙ্গে তা ছিল ৪.২ শতাংশ।

১৯৯২-৯৩ সালে শস্য চাষের নিবিড়তা ছিল ১৫৫ শতাংশ। ২০১১ সালে তা ১৯২ শতাংশ। এক্ষেত্রে তখন পশ্চিমবঙ্গ ছিল দেশের মধ্যে দ্বিতীয়। রাজ্যে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৭৬-৭৭ সালে ছিল ৭৪ লক্ষ টন। ২০১০-২০১১-তে তা প্রায় ১৭০ লক্ষ টন। মাছ উৎপাদনেও এই সময়পর্বে দেশের মধ্যে টানা প্রথম স্থান বজায় রেখেছিল পশ্চিমবঙ্গ।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে রেকর্ড পরিমাণ বিনিয়োগ এসেছিল ২০০৬ সাল থেকে। ২০০৬-০৭ থেকে ২০০৯-১০ অর্থবর্ষে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ১৪২৬টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছিল, যেগুলিতে মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৩৩০৫ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছিল ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৩২৫ জনের।

শিল্প বিনিয়োগ

২০০১ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরে রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে প্রতি বছর গড়ে বিনিয়োগ হয়েছিল ৫ হাজার কোটি টাকা। সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ হয়েছে ২০০৯ সালে— সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা। এই সময়ের মধ্যে ২০৬টি বড়ো এবং মাঝারি শিল্প ইউনিটও তৈরি হয়েছে।

অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর রিপোর্ট বলছে, ২০১০-র সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সারা দেশে যেখানে ১ কোটি ৪ লক্ষ ৯৩ হাজার ৬০১ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব

এসেছে সেখানে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ৫ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯০৪ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব ছিল ব্যবসায়ী ও শিল্প মহলের।

রাজ্যে যেসব ক্ষেত্রে বেশি বিনিয়োগ হচ্ছিল তার প্রথমেই ছিল কেমিক্যাল ও পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প দ্বিতীয় স্থানে। এবং খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প তৃতীয় স্থানে। কেমিক্যাল ও পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে এই রাজ্যে ৯০০ টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট তৈরি হয়েছিল এবং সেখানে ১ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে। আইটি-র মতো মেধাভিত্তিক শিল্পেরও দ্রুত বিকাশ ও সম্প্রসারণ ঘটেছে।

৬২-তম **জাতীয় নমুনা সমীক্ষা**র মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট তৈরি এবং সেই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে এক নম্বর জায়গায় উঠে এসেছিল। ২০০৫-০৬ সালে তথ্যপ্রযুক্তিতে রপ্তানি থেকে পশ্চিমবঙ্গ আয় করেছিল ২৭০০ কোটি টাকা। ২০১০-১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৬৪০০ কোটি টাকা। ২০০৫-০৬ সালে তথ্যপ্রযুক্তিতে কাজ করতেন ৩২ হাজার। ২০১১ সালে এক লক্ষের বেশি ছেলেমেয়ে শুধু কলকাতায় তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রেই কর্মরত ছিলেন। তিন বছরের মধ্যেই এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হওয়ার ইঙ্গিত-ও ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বীকৃতি হিসাবে জ্যোতি বসু নগরে (রাজারহাট) দেশের দ্বিতীয় 'ফিনান্সিয়াল হাব'-এর কাজ শুরু হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি।

রাজ্যে ২০১০-১১ সালে প্রায় ২৮ লক্ষ ক্ষুদ্রশিল্প ইউনিটে প্রায় ৫৫ লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে।

হলদিয়া পৌরসভা এলাকা ও নয়াচরকে কেন্দ্র করে একটি পেট্রোলিয়াম কেমিক্যাল পেট্রোকেমিক্যাল ইনভেস্টমেন্ট রিজিয়ন

(পিসিপিআইআর) স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার ২০০৯ সালে।

বন্ধ শিল্প শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা

১৯৯৮ সালে বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকার প্রকল্প চালু করেছিল। ২০১০-১১ সালে বন্ধ কারখানার একজন শ্রমিক মাসিক ভাতা পেতেন ১৫০০ টাকা। ২০০৭ সালে এই প্রকল্পে রাজ্যের ২৪০টি শিল্পের ৪১,৪৯৩ জন শ্রমিক সামাজিক সুরক্ষা পেয়েছেন। ২০০৮-০৯ সালে ৩৮,৬৬৪ জন, ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে ৩৬,৫২০ জন এবং ২০১০-১১ সালে ৩৩,৫৭১ জন শ্রমিক এই সামাজিক সুরক্ষার সাহায্য পেয়েছেন।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের সামাজিক সুরক্ষা

২০০১ সালে এই রাজ্যে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রকল্প চালু হয়েছিল। সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের এই প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করেছিল স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প। ৩২ লক্ষ শ্রমিক এই ব্যবস্থার উপকার পেত। আরও বেশি সংখ্যক শ্রমিককে এই প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য রাজ্যে ৬১ টি বিভিন্ন পেশা এবং জীবিকাকে অসংগঠিত ক্ষেত্র হিসাবে সরকার ঘোষণা করেছিল। এই ৬১টি পেশা বা জীবিকার মধ্যে ছিল দর্জিশিল্পী থেকে শুরু করে মৎস্যজীবীরাও।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার প্রশ্নে তাঁদের চিকিৎসার বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়েছিল। একজন অসংগঠিত শ্রমিক কম পক্ষে ৫ দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকলে তাঁর কর্মহীনতার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে

প্রতিদিন ২০০ টাকা করে ৫ দিনের জন্য ১ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এরপরেও ঐ শ্রমিক চিকিৎসাধীন থাকলে প্রতিদিন তাঁকে ১০০ টাকা করে সরকার দিত। তার সঙ্গে দেওয়া হত ওষুধের দাম, চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষার খরচ।

অসংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের সঙ্গে রাজ্যের বিড়ি শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকার একগুচ্ছ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের কাজ করেছিল। এই প্রকল্পের মধ্যে ছিল— 'বিড়ি শ্রমিকদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ', 'বিড়ি শ্রমিকদের বাড়ি তৈরির জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান', 'বিড়ি শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিকাঠামো উন্নয়ন।' রাজ্য সরকার এই প্রকল্পে খরচ করেছিল ১০ কোটি ৪৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। এর সঙ্গেই বিড়ি শ্রমিকদের গৃহনির্মাণের জন্য জন্য অনুদান ছিল।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকার বেশ কিছু সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু করেছিল। নির্মাণ শ্রমিকদের পেনশন, দুর্ঘটনাজনিত চিকিৎসা ভাতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল গৃহ নির্মাণে ঋণ, শিক্ষার জন্য অনুদান, মাতৃত্বকালীন আর্থিক সহায়তা, শ্রমিক পরিবারে বিবাহ বাবদ সাহায্য, যন্ত্রপাতি কেনার জন্য আর্থিক সাহায্য এমনকী চশমা কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা।

ব্যবস্থা করা হয়েছিল, নির্মাণ শ্রমিকরা পাঁচ বছর তালিকাভুক্ত থাকলে ৬০ বছর বয়সের পর প্রতিমাসে ৫০০ টাকা থেকে ৮৭০ টাকা পেনশন পাবেন। বহু নির্মাণ শ্রমিক এই পেনশন গ্রহণ করছিলেন। কঠিন অসুখের জন্য এবং মৃত নির্মাণকারীর পরিবারকে এককালীন আর্থিক সাহায্য করেছে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার।

দারিদ্র্য

কেন্দ্রীয় সরকারের 'পভার্টি এরাডিকেশান ইন ইন্ডিয়া বাই ২০১৫, রুরাল হাউসহোল্ড সেন্টার্ড স্ট্র্যাটেজি পেপার' অনুযায়ী ১৯৭৩

থেকে ২০০৫, এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে দারিদ্র্য কমেছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে এই রাজ্যের ২ কোটি ৫৭ লক্ষ ৯৬ হাজার গ্রামবাসী দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করতেন। দেশের মোট গ্রামবাসীর তাঁরা ছিলেন ৯.৯ শতাংশ। ২০০৫-এর মার্চ পর্যন্ত পরিসংখ্যান বলছে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি সত্ত্বেও এই রাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী গ্রামবাসীর সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ২২ হাজার। সারা দেশের গ্রামবাসীদের মধ্যে তাঁরা তখন ৭.৮ শতাংশ। অথচ এই একই সময়ে সারা দেশে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশাসহ প্রায় প্রত্যেক রাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। সরল পাটিগণিত বলছে, একই সময়ে সারা দেশে দারিদ্র্য কমেছে ৬ কোটির কিছু বেশি মানুষের। তার মধ্যে একা পশ্চিমবঙ্গে কমেছে প্রায় ৮৫ লক্ষ মানুষের।

শিক্ষা

বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্জন রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে আনা। শিক্ষা জগতকে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করা। ২০১০-১১ সময়কালের মধ্যে রাজ্যে ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৫০টি ডিগ্রি কলেজ, ২৯টি আইটিআই, ৪৩টি পলিটেকনিক কলেজ, ৬৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৪৫টি ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট, ১২৮টি বি এড কলেজ, ২৩টি আইন কলেজ এবং ৪টি আর্ট কলেজ এবং ২৯টি শারীরশিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ রয়েছে। রাজ্যে উচ্চশিক্ষায় ৫১০টি নতুন বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে। ২০০৬-১১ সময়পর্বের মধ্যে গঠিত হয়েছিল ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৭৩টি কলেজ। এই ৫ বছরে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গড়ে উঠেছেল সেগুলি হলো— পশ্চিমবঙ্গ

রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় ও সিদো-কানহু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়।

পাশাপাশি রাজ্যে শিক্ষায় গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ার অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করতে গঠন করা হয় কলেজ সার্ভিস কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা সংসদ, স্কুল সার্ভিস কমিশন ও পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ড।

বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম বড়ো কৃতিত্ব রাজ্যে নতুন নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গড়ে তোলা। ১৯৭৭ সালে রাজ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল মাত্র ৯টি। ২০১১ সালে রাজ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯০টি। আসন সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৮ হাজার ৭৫১। ২০০১ সালে কারিগরি, প্রযুক্তি সংক্রান্ত এবং ম্যানেজমেন্ট শিক্ষাকে সংহত করতে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি নামে একটি আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৯২-৯৩ সালে উচ্চশিক্ষায় রাজ্যে বরাদ্দ হয়েছিল ২২০ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। ২০০০-০১ সালে উচ্চশিক্ষায় রাজ্য সরকার খরচ করেছে ৫২৬ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা। সেই বরাদ্দের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে ২০১০-১১ সালে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৯৪৩ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা।

১৯৭৬-৭৭ সালে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে রাজ্য সরকার খরচ করত ৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। ২০০৯-১০ সালে ৬১০ কোটি টাকা।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার

আলোচ্য সময়পর্বে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়— এই রাজ্যের বেশিরভাগ শিশু সরকারি স্কুলে পড়ত। ২০০৯ সালে যে সমস্ত শিশুরা স্কুলে যেত, তার ৮৫.৪ শতাংশ সরকার পরিচালিত স্কুলে যেত। তার কারণ এই

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সরকারি স্কুলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে ২০০০-০১-এ প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ৪০৯১১টি। ২০০৮-এ তা বেড়ে হয় ৪২৬২৪টি। এই রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির ফলে স্কুলছাত্রদের মধ্যে লিঙ্গজনিত বৈষম্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

১৯৭৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ছিল ৯৬৭টি, মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৬৬৬টি। ২০১০-১১-তে সেই সংখ্যা ৪ হাজার ৫৭৯ এবং ১৩ হাজার ৩৪৮। এই সময়পর্বেই আদিবাসী প্রধান এলাকার ৮০০টি বিদ্যালয়ে অলচিকি লিপিতে পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। মোট ১৩০০টি বিদ্যালয়ে অলচিকিতে পড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছিল। বিদ্যালয় স্তরের পর সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্য নিয়েও রাজ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনার সুযোগ বাড়ানো হয়েছিল। ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে কয়েকটি কলেজে প্রথম বিএ (জেনারেল) কোর্স শুরু করা হয় সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্য। পরের শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু করা হয় অনার্স কোর্স। ২০১০-১১ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১০টি কলেজে এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ৯টি কলেজে সাঁওতালী ভাষা নিয়ে জেনারেল ও অনার্স কোর্স পড়ার সুযোগ পেয়েছিল ছাত্রছাত্রীরা। সাঁওতালীতে এমএ কোর্স শুরু হয়েছিল ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৯৯৮ সালে প্রথমবার শিক্ষক পদে নিয়োগের পরীক্ষা নেয় স্কুল সার্ভিস কমিশন। সেবার চাকরি পান ৮ হাজার ৭২ জন। ১৯৯৯ সালে পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ হয়েছিলেন ১০ হাজার ৯৮৭ জন। এরপর পরীক্ষা হয় ২০০১ সালে। তৃতীয়বারে শিক্ষক-শিক্ষিকা পদের চাকরি প্রাপকের সংখ্যা বাড়ে। ঐ বছর চাকরি পান মোট ১২ হাজার ৬৪১জন। ২০০২ সালে চাকরি পান ৯ হাজার ৯৮০জন, ২০০৪ সালে চাকরি পান ৮ হাজার ৬৫৮ জন। ষষ্ঠবারে

১৪ হাজার ২৬৭জন, সপ্তমবারে ২০ হাজার ৮৮৭জন, অষ্টমবারে ১০ হাজার ৯৯৫ জন, নবম দফায় ১২ হাজার ৯৩১ জন এবং শেষ বছরে ১৩হাজার ৬৭৭ জন চাকরি পেয়েছেন।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী

২০১০-১১ সালে রাজ্যে ১২ লক্ষের বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী ছিল। ২০০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৮০ হাজার। ২০১০ সালের শেষে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭৩৯। সাড়ে চার বছরে ৮ লক্ষ ২০ হাজার সংখ্যাবৃদ্ধি। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সদস্যদের ৯০ শতাংশের বেশি, অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ছিলেন মহিলা।

তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্র

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত পথ চলা শুরু হয়েছিল পঞ্চম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। ২০০৬ সালে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে এই রাজ্যে নিযুক্ত ছিলেন ৩২ হাজার পেশাদার কর্মী। ২০১০ সালে যে সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ১ লক্ষ ৫ হাজার। ২০০৬-২০১১ সময়পর্বে এ-রাজ্যে ছোটো, মাঝারি এবং বড়ো মিলিয়ে প্রায় দেড়শোটি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা এসেছিল। ২০১১ সালে এই সংখ্যা প্রায় পাঁচশো।

২০০৯ সালে রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি নীতি সংশোধন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয় হার্ডওয়ার শিল্পকেও। ২০১০ সালে, হার্ডওয়ার শিল্পের জন্য পৃথক নীতি ঘোষণা করা হয়। বিধাননগর সেক্টর ফাইভ ছাড়াও বানতলা, নোনাডাঙা এবং রাজারহাটেও গড়ে তোলা হয় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের পরিকাঠামো। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকা ছাড়াও দুর্গাপুর এবং শিলিগুড়িতেও গড়ে তোলা হয় তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক।

অদূর ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় হলদিয়া, খড়গপুর এবং কল্যাণীতে সেই পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছিল।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ

২০১০-১১ সালের মধ্যে রাজ্যে এই ক্ষেত্রে শিল্প গড়ে উঠেছিল মোট ১২ হাজার ১৭৫টি। তাতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ মানুষের। এক্ষেত্রে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারের উল্লেখযোগ্য সংযোজন, রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ নীতি এবং এক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান নীতি প্রণয়ন, যাতে এই শিল্পের সাফল্যকে সংহত করা যায় এবং আরও ছড়িয়ে দেওয়া যায়, যার মাধ্যমে গড়ে ওঠে একটি সামঞ্জস্য। সেই কারণেই রাজ্যের তুলনামূলক পশ্চাৎপদ এলাকাগুলিতে এই শিল্প গড়লে যেমন বিশেষ আর্থিক অনুদানের বাড়তি সুযোগ পাওয়া যাবে, তেমনই স্বনির্ভর গোষ্ঠীসহ ছোটো ছোটো সংস্থাগুলিও যাতে এই শিল্প গড়ায় আগ্রহ পায়, সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য

প্রতিবন্ধী ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, আদিবাসী বার্ধক্য ভাতা, মৎস্যজীবীদের ভাতা, কৃষক ভাতা, বিধবা ভাতা- এরকম যেকটি মাসিক ভাতা রাজ্য সরকার দিত তার সবকটির ক্ষেত্রেই পরিমাণ ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০০ টাকা হয়েছিল ২০০৬-১১ সালের মধ্যে। ভাতা প্রাপকের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে বহুগুণ।

- হকারদের কল্যাণে 'শহরাঞ্চলের হকার সংক্রান্ত নীতি' (ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান স্ট্রিট ভেন্ডর পলিসি) গ্রহণ করেছিল (অক্টোবর ২০১০) সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার।

হকারদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, প্রশিক্ষণ, ঋণদান প্রভৃতি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এই নীতির পরিকল্পনা।

- ইন্দিরা আবাসন যোজনায় ২০০৮-০৯ সালে নির্মিত হয়েছিল ১,১১,৫১২টি বাড়ি। ২০০৯-১০ সালে তৈরি হয়েছে ২,১৪,৮২৭টি বাড়ি অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ।

- ১০০ দিনের কাজে ২০০৮-২০০৯ সালে রাজ্যে শ্রমদিবস তৈরি হয়েছে ৭৮৬ কোটি ৬২ লক্ষ। ২০০৯-২০১০ সালে তৈরি হয়েছে ১৫৫১ কোটি ৭১ লক্ষ শ্রমদিবস। ২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-র আগস্ট পর্যন্ত সময়ে রাজ্যে মোট ৪৫১৬ কোটি ৯লক্ষ শ্রমদিবস তৈরি হয়েছে

- সংখ্যালঘু মহিলা ক্ষমতায়ন কর্মসূচি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আর কোথাও সংখ্যালঘু মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ৫০ শতাংশ ভরতুকি দেওয়া হত না।

- পঞ্চায়েতের ত্রিস্তরে প্রায় ৪০শতাংশ আসন ছিল মহিলাদের। প্রায় ৩৬ শতাংশ আসনে তফসিলী জাতি, ২৩ শতাংশ মুসলিম। এটি ছিল একটা নজিরবিহীন ঘটনা। পঞ্চায়েতের ত্রিস্তরে পিছিয়ে পড়া মানুষের অংশগ্রহণের এই হার থেকে প্রমাণিত, রাজ্যের নীতি নির্ধারণকারী সংস্থাগুলিতে আদিবাসী, সংখ্যালঘু এবং মহিলারা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

- রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে ৪১.৭৩ শতাংশ প্রধান, ৩৯.৬৯ শতাংশ সভাপতি এবং ৫০ শতাংশ সভাধিপতি পদে ছিলেন মহিলারা। ৩৯.৮৯ শতাংশ উপপ্রধান,

৩৬.২৫ শতাংশ সহকারী সভাপতি এবং ৩৮.৮৯ শতাংশ সহকারী সভাধিপতির পদেও ছিলেন মহিলারাই।

- ৪১.২৪ শতাংশ প্রধান, ৩৭.৩৮ শতাংশ সভাপতি এবং ৩১.২৫ শতাংশ সহসভাপতি পদে ছিলেন তফসিলী জাতির মানুষ। এই পদগুলিতে সাধারণ হিন্দুর প্রতিনিধিত্বের হার যথাক্রমে ২৪.২০ শতাংশ, ৩২.৫৯ শতাংশ এবং ৩৭.৫০ শতাংশ। ঐ একই পদে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব যথাক্রমে, ১৯.৫৩ শতাংশ, ১৬.৬১ শতাংশ এবং ১২.৫০ শতাংশ।

এই সমস্ত পরিসংখ্যান থেকে একটা বিষয় খুবই পরিষ্কার— পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতেও সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব ছিল।

কর্মসংস্থানমুখী উন্নয়ন

সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারের মেয়াদে কৃষি, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প, স্বনিযুক্তি প্রকল্প, পরিষেবা কর্মকাণ্ড সব মিলিয়ে প্রতি বছরে গড়ে ৭ থেকে ৮ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। অন্যত্র যখন বেকারি বাড়ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের বিকল্প নীতির মূল কথা ছিল কর্মসংস্থানমুখী উন্নয়ন। শুধুমাত্র এক হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস এবং সাড়ে ন'শোর বেশি অনুসারী শিল্প সংখ্যায় প্রায় দু'লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার প্রথম বাজেটেই (২০০৬-২০০৭) 'বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প' (বিএসকেপি) শহর এলাকা থেকে গ্রামীণ এলাকাতেও সম্প্রসারিত করে। বিএসকেপি-তে রাজ্য সরকারের অনুদানের পরিমাণ গত পাঁচ বছরে প্রায় দশ গুণেরও

বেশি বাড়ানো হয়েছে। ২০০৬ সালের আগে সরকারি অনুদান ছিল ১৪ কোটি টাকা। ২০১১ সালের মধ্যে হয়েছে ১৭০ কোটি টাকা।

'পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক কর্মসংস্থান প্রকল্প' রাজ্য সরকার চালু করেছে ২০১০ সালে। ২০১০-১১ অর্থবর্ষে এজন্য ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

রাজ্য শ্রম দপ্তর ২০০৮ সালে 'উদীয়মান স্বনির্ভর কর্মসংস্থান' প্রকল্প চালু করেছিল। এই নতুন প্রকল্পে ব্যক্তিগতভাবে বা সমবায়/ সোসাইটি মারফত উদ্যোগ গ্রহণ করলে রাজ্য সরকার আর্থিক সাহায্য দিত।

স্বাস্থ্য পরিষেবা

- ১৯৭৭ সালে মেডিক্যাল কলেজ ছিলো ৭টি। ২০১০-১১ সালের মধ্যে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১২টি। এই সময়কালে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে আসন সংখ্যা যথাক্রমে ৭৫৫ এবং ১১৭ থেকে বেড়ে হয়েছিল ১৩৫৫ এবং ৭০০।

- রাজ্যের ৭৩ শতাংশ মানুষের চিকিৎসা করতেন সরকারি হাসপাতালেই। যেখানে গোটা দেশে গড়ে ৪০ শতাংশ মানুষের চিকিৎসা হত সরকারি হাসপাতালে।

- ২০১০-১১ সালের হিসাব অনুযায়ী গড় আয়ু জাতীয় স্তরের ক্ষেত্রে ছিল: পুরুষ ৬৫.৮ বছর ও মহিলা ৬৮.১ বছর। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে পুরুষ ৬৮.২৫ বছর ও মহিলা ৭০.৯ বছর। প্রসূতি মৃত্যুর হার জাতীয় স্তরের ক্ষেত্রে প্রতি লক্ষে ২৫৪ জন; তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ১৪১ জন। শিশু মৃত্যুর হার জাতীয় স্তরের ক্ষেত্রে প্রতি হাজারে

৫৩ জন; তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ৩৫জন। (রাজ্যের স্থান চতুর্থ)।

- ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ১৩২৬। ২০১০ সালে তা বেড়ে ১২০০০ হয়। এই সময়সীমার মধ্যে হাসপাতালগুলির শয্যা সংখ্যা ৫৩৫০৯ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১ লক্ষেরও বেশি। তাছাড়া এই সময়ের মধ্যে পরিবার কল্যাণ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ১০০৫ থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১০ হাজার ৩৫৬টি।

- প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার বেড়ে হয় শতকরা ৬৯.৫ শতাংশ।

- শিশুদের টীকাদান প্রকল্পের হার বেড়ে হয় শতকরা ৭৫.৮ শতাংশ।

হত্যা

রাজ্যবাসীর মাথাপিছু আয় বিষয়ে সর্বশেষ যে-বছরের তথ্য পাওয়া যায় সেই হিসাবটি খেয়াল করলেই দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ আসলেই একটি দরিদ্র রাজ্য। এমনকি পাশের রাজ্য ওড়িশাতেও মাথাপিছু গড় আয় পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বেশি। ভারতবর্ষে ছোটোবড়ো মিলিয়ে ৩৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। তার মধ্যে আয়তনের দিক থেকে বড়ো এরকম ২১টি রাজ্যে নিট রাজ্যগত মাথাপিছু উৎপাদন বিচার করলে দেখা যায় তৃণমূল শাসিত পশ্চিমবঙ্গ মাথাপিছু আয়ের বিচারে আছে তলার দিক থেকে সপ্তম স্থানে। বাকি সব রাজ্য এমনকি ত্রিপুরা পর্যন্ত মাথাপিছু আয়ে পশ্চিমবঙ্গের থেকে এগিয়ে। তেলেঙ্গানার মাথাপিছু আয় বছরে ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫৬৪ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু আয় বছরে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ১১৯ টাকা।

মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি

২০১০-১১ ছিল বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনের শেষ বছর। সে-বছরই তৃণমূল আসে সরকারে। ২০১০-১১ থেকে ২০২৩-২৪— এমন একটা সময় যখন মমতা ব্যানার্জি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কালের নিয়মে এই সময়ে রাজ্যের মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি অবশ্যই হয়েছে। সংখ্যার হিসেবে ২২৬.২৩ শতাংশ। অথচ, ওই একই সময়ে তামিলনাড়ু, কেরালা কিংবা ওড়িশায় মাথাপিছু আয়

বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৩০১.৭০ শতাংশ, ৩০১.৭৬ শতাংশ এবং ৩১২.৫৩ শতাংশ। এমনকি বিহারেও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটেছে ২৬০.৭৩ শতাংশ। রাজ্যটিতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটেছে মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, সংশ্লিষ্ট তথ্যে তার অন্তত কোনও স্বীকৃতি নেই।

কাজের জগৎ

ইন্ডিয়া এমপ্লয়মেন্ট রিপোর্টের তথ্য অনুসারে এ-রাজ্যের কর্ম-পরিস্থিতি মাঝারি মানের। বলা যায়, কেবল ঝাড়খণ্ড, বিহার অথবা ওড়িশায় কর্ম-পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় খারাপ। বাকি সব রাজ্যে সূচক অনুসারে কর্ম-পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় ভালো। কর্ম-পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে ভালো হওয়ার কারণেই তেলেঙ্গানা, গুজরাট, কর্ণাটক, বিংবা কেরালায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে জীবিকার সন্ধানে বহু শ্রমজীবী মানুষ কাজের সন্ধানে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে অবস্থা ভালো নয়, কোনও রকমে কাজ হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু সে-কাজে মজুরি একেবারেই কম।

অভিবাসন

২০১১-১৮, যত মানুষ ভিন রাজ্য বা ভিন দেশ থেকে এই রাজ্যে বসবাস করতে এসেছেন তার থেকে বেশি সংখ্যার মানুষ এই রাজ্য ত্যাগ করেছেন। নিট অভিবাসন মাইনাস (-) ১১,০৭,০৬৮। আগেই দেখেছি ২০০১ থেকে ২০১১-র সময়সীমায় অর্থাৎ এই শতাব্দীর প্রথম দশকে রাজ্যে নিট অভিবাসন ছিল মাইনাস (-) ৯৮,৩২৮ জন। শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রথম সাত বছরে অর্থাৎ তৃণমূল শাসনের প্রথম সাত বছরে এই সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে আনুমানিক মাইনাস (-) ১১,০৭,০৬৮ জন। যে-প্রবণতা দেখা

দিয়েছিল বাম শাসনের শেষ দশকে সেই প্রবণতা তীব্রতর হয়েছে তৃণমূল শাসনে। তবে সেন্সাস তথ্য বলছে, দশকওয়াড়ি অভিবাসনে এ-রাজ্য ত্যাগ করে যাওয়ার যে-প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তার মূল কারণ জীবিকা। জীবিকা নেই, বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে, পরিচ্ছন্ন জীবিকা নেই। ফলে শ্রমজীবী মানুষ বাধ্য হচ্ছেন রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে।

কৃষি

সম্প্রতি প্রকাশিত নাবার্ডের তথ্য অনুসারে, এ-রাজ্যের কৃষিজীবী পরিবারের মাসিক গড় আয় ৭,৭৫৬ টাকা। অর্থাৎ বছরে পারিবারিক গড় আয় ৯৩,০৭২ টাকা। অথচ, ২০১৮ সালের জুন মাসে মমতা ব্যানার্জি লিখিতভাবে দাবি করে বসেন, এ-রাজ্যের কৃষিজীবী পরিবারের গড় বার্ষিক আয় ছিল ২,৯২,০০০ টাকা। যদিও ঘটনা হল, নাবার্ডের রিপোর্ট অনুসারে কৃষিজীবি পরিবারের মাসিক আয়ের নিরিখে দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ২২-তম। শীর্ষস্থানে থাকা পাঞ্জাবের কৃষিজীবি পরিবারের মাসিক আয় গড়ে ২৩,১৩৩ টাকা। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি ধরলে রাজ্যের কৃষিজীবী পরিবারের আয় পাঞ্জাবের চেয়েও বেশি! নাবার্ডের তথ্য অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গে অ-কৃষিজীবি পরিবারের মাসিক গড় আয় ৬,৩৮৩ টাকা। কেরালায় এই ধরনের পরিবারের গড় মাসিক আয় ১৪,৮৬৩ টাকা। কোনও নিরিখেই এগিয়ে নেই গ্রামবাংলা। আর রাজ্য সরকার শোনাচ্ছেন ৩ লক্ষ টাকা আয়ের গালগপ্প।

নারীদের অবস্থা

অকাল-বিবাহ: দেশের নানা রাজ্যে বেশ কবছর ধরে বিশেষত মেয়েদের মধ্যে বাল্যবিবাহ বা নাবালকবিবাহের হার কমছে ঠিকই,

তবে তা সন্তোষজনক নয়। উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই হার উদ্বেগজনক রকমের বেশি। এমনকি দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। দেখা যাচ্ছে, ন্যাশানাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে-৫ (২০১৯-২০২১)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, কখনও-না-কখনও বিয়ে হয়েছে এমন ২০-২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রায় ৪২ শতাংশের বিয়ে হয়েছে ১৮ বছর বয়সের আগে। জেলাগতভাবে দেখলে, ২০১৫-১৬ সালে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর ছিল সেই চারটি জেলা যেখানে ৫০ শতাংশের বেশি মেয়েদের ১৮ বছরের কমে বিয়ে হয়েছে, ২০১৯-২১ সালে এই চিত্র দেখা গেছে মুর্শিদাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। যদিও বীরভূম, বাঁকুড়া, কোচবিহারের মতো দরিদ্র জেলার সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান ও হুগলি জেলায়ও এই চিত্র যথেষ্ট উদ্বেগজনক— ৪০ থেকে ৪৯ শতাংশের মধ্যে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে বাঁকুড়া, হুগলি এমনকি কলকাতা জেলার অবস্থা ২০১৫-১৬ সালের থেকে ২০১৯-২১ সালে খারাপ হয়েছে।

নারী ও শিশুপাচার: ২০২২ ও ২০২৩ সাল মিলিয়ে নিখোঁজ সন্ধান না-পাওয়া অপ্রাপ্তবয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক মোট নারীর সংখ্যা ৮১,৯০২ জন। এক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সব রাজ্যের মধ্যে শীর্ষে।

নারী-স্বাস্থ্য: ন্যাশানাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে—৫-এর (২০১৯-২০) প্রতিবেদন অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের ৭১ শতাংশ অ্যানিমিয়া আক্রান্ত (পুরুষদের মধ্যে এই হার ৩৯.২ শতাংশ)। ভারতে ওই বয়সী নারীদের মধ্যে এই হার ৫৭ শতাংশ। স্পষ্ট বোঝা যায়, পুষ্টিকর খাবারের অভাবের জন্য এ-অবস্থা। আর বাস্তবতা হল রাজ্যে এমন কোনও কার্যকরী বন্দোবস্ত নেই, যার মাধ্যমে নারীদের বুনিয়াদি স্বাস্থ্যের ধারাবাহিক নিরীক্ষণ সম্ভব হয়,

বা সমতার নীতি মেনে সকল নারীর জন্য বাড়তি খাবারের বন্দোবস্ত করা যায়।

নারী-শিক্ষা: রাজ্য সরকারের বয়ানে কন্যাশ্রী-র মতো প্রকল্পের মাধ্যমে অকালবিবাহ কমানোর বা রোধ করার উদ্যোগ করা হয়েছে ২০১২ সালে। প্রশ্ন হল— কন্যাশ্রীর মতো অর্থ প্রদানকারী উপায় আদৌ বাল্যবিবাহের মতো সমস্যার সমাধান করতে, নিদেনপক্ষে রাশ টানতে পারে কিনা? ২০০৭-১৬ সালের সময়কালে বাল্যবিবাহ উল্লেখযোগ্য রকমের কমেছে (১৩.৪ শতাংশ)। এই সময়কালের মাত্র শেষ চার বছরে কন্যাশ্রী সক্রিয় থেকেছে। কিন্তু তারপর আর কমেনি। উপরন্তু, ২০১২-২২ সালের মধ্যে বন্ধ হয়েছে ৭০০০ স্কুল— ২০১২ সালে ছিল ৭৪৭১৭টি প্রাথমিক স্কুল, যা ২০২২ সালে কমে হয়েছে ৬৭৬৯৯টি।

নারীর বিরুদ্ধে হিংসা: ওয়ার্ল্ড ব্যাংক-এর ২০১৮ সালের প্রতিবেদনের তথ্য বিশ্লেষণ বলছে, নারীদের বিরুদ্ধে ঘটা হিংসা, এমন এক বিশ্ব অতিমারিতে (গ্লোবাল প্যানডেমিক) পরিণত হয়েছে। সার্বিকভাবে নারীর বিরুদ্ধে হিংসার ক্ষেত্রে ২০২৩ সালের এনসিআরবি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে হিংসার হার ৭১.৩ (এক লক্ষ জনসংখ্যা পিছু), যা ভারতের গড়ে ৬৫.৩। ফলে কোন অবস্থায় বাংলার মহিলারা রয়েছেন সহজেই অনুমেয়।

গ্রামের অর্থনীতি

পারিবারিক ভোগব্যয় কত: ঋণের প্রয়োজন কেন হল গ্রামীণ পরিবারগুলির? কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তর যে ভোগব্যয়ের সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করে তার ভিত্তিতে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে প্রতি

পরিবার পিছু মাসে গড়ে ভোগব্যয় ১৩,৬১৪.৭৩ টাকা। এর মধ্যে গ্রাম-শহরে ফারাক আছে। ২০২৩-২৪ সালে প্রতি মাসে মাথাপিছু গড় ভোগব্যয় বাংলার গ্রামে ৩,৬২০ টাকা যা শহরে ৫,৭৭৫ টাকা। গ্রামীণ এই মাথাপিছু ব্যয়ের চেয়ে নিচে যে রাজ্যগুলি রয়েছে তা হল ঝাড়খণ্ড, ছত্তিসগড়, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশ। বাংলার আর্থিক বিপর্যয় এই তথ্য স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে।

আয়ের পথ কোথায়?

২০১১-২০২৪ সালের মধ্যে এ-রাজ্যে কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির হার মাত্র ১.৩ শতাংশ। কৃষিতে আয়ের সুযোগ কম জেনেও কৃষিতে স্বনিযুক্তি বেড়েছে এই কয়েক বছরে। ২০২৩-২৪ সালের পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে-র রিপোর্টে জানা যাচ্ছে যে রাজ্যে দৈনিক ৫০ টাকার কম আয় করে এরকম মানুষের ৬৩ শতাংশ কাজ করেন কৃষি এবং কৃষিজ ক্ষেত্রে। ২০০১ থেকে ২০১১ সালের আদমসুমারি রিপোর্টেও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে যে অ-কৃষি ক্ষেত্রের উত্থানের প্রমাণ পাওয়া যায়, ২০১১ সালের পর সেই ক্ষেত্রের সংকোচন চোখে পড়ে, গ্রামীণ শিল্পের বিকাশেও শ্লথগতি আসে। শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমে আসে এবং কর্মসংস্থান কমে আসে।

ক্ষুদ্রফিনান্সের রমরমা

এই মুহূর্তে ২৩টি জেলায় ক্ষুদ্রফিনান্সের মাধ্যমে ঋণের পরিমাণ ৩৩,১৮১ কোটি টাকা। ২০২৫ সালে প্রকাশিত ক্ষুদ্রফিনান্স-সংক্রান্ত একটি বেসরকারি রিপোর্ট বলছে, দেশের মধ্যে ২৫টি জেলায় ক্ষুদ্রফিনান্সের বাড়বাড়ন্ত বেশি, এর মধ্যে ৬টি পশ্চিমবঙ্গে। এর মধ্যে শীর্ষে গ্রামীণ মুর্শিদাবাদ। গ্রামীণ দারিদ্র্যের এক প্রকাশ বাংলার গ্রামে এই ক্ষুদ্রফিনাসের রমরমা। বেসরকারি এই সংস্থাগুলি

গজিয়ে উঠেছে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা চড়া সুদে রাজ্যের মানুষকে ঋণদান করার জন্য।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামকে ঘিরে গত কয়েক বছরে ঘটে গেছে একের পর এক দুর্নীতি। মনরেগা, আবাস যোজনা, পরিবেশ, শিক্ষায় নিয়োগকে কেন্দ্র করে আর্থিক কেলেঙ্কারির পরিমাণ সীমাহীন।

স্বাস্থ্যক্ষেত্র

২০১৮ সাল থেকেই রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য বিষয়ক সামগ্রিক তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করা বন্ধ করে দিয়েছে, আর এই একই ধরনের কাজ করেছে দেশের সরকারও। তবুও দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতির নিরিখে রাজ্যের অবস্থানটি বুঝতে চাইলে ভরসা বলতে সেই ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে।

প্রসূতি-মৃত্যু

রেজিস্ট্রার জেনারেল যে-তালিকা প্রকাশ করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে প্রসূতি-মৃত্যুর হারে আমাদের রাজ্যের অবস্থান জাতীয় গড়ের চাইতে ঢের খারাপ। প্রতি এক লক্ষ শিশু-জন্মে মাতৃ-মৃত্যুর হার, এই রাজ্যে ১০৪, যেখানে জাতীয় গড় ৮৮। ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড, সবাই আমাদের আগে; আপাতত আমরা বিহারের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতায় আছি।

বেশ কয়েক বছর ধরেই এই রাজ্যে কিশোরী-বিবাহ বাড়ছে, এবং তার সঙ্গে প্রত্যাশিতভাবেই বাড়ছে অপ্রাপ্তবয়স্কা মায়েদের সংখ্যা। অপুষ্ট ও অপরিণত দেহে সন্তানের জন্ম দিতে হলে মাতৃ-মৃত্যু এবং সদ্যোজাত-মৃত্যু, দুইই যে বাড়বে, এ-নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে কি? এবং বছর বছর স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়তে থাকলে, একের পর এক সরকারি স্কুল বন্ধ হতে থাকলে, অপ্রাপ্তবয়স্ক-

বিবাহের সংখ্যা যে বাড়বে, তাতেও অবাক হওয়ার কারণ আছে কি?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০১১ সালের সেনসাসে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মৃত্যুহার ছিল সবচেয়ে কম, জন্মহার নিয়ন্ত্রণের সূচক টোটাল ফার্টিলিটি রেট ছিল দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন, শিশু-মৃত্যুর বিভিন্ন সূচক যেমন নিওন্যাটাল মর্টালিটি রেট, ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট, আন্ডার-ফাইভ মর্টালিটি রেট, তিনটিতেই রাজ্যের স্থান ছিল জাতীয় গড়ের চাইতে ঢের উন্নত। আমরা ছিলাম শ্রেষ্ঠত্বের তালিকায় চার নম্বরে। আজ কী অবস্থা?

মেয়েদের মধ্যে রক্তাল্পতা

এনএফএইচএস-এর তথ্য যদি দেখি, তাহলে দেখতে পাব যে রাজ্যে বয়ঃসন্ধিকালীন মেয়েদের মধ্যে রক্তাল্পতা (অ্যানিমিয়া) ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এনএফএইচএস-৩ (২০০৫-০৬ সালে সংগৃহীত তথ্য) অনুসারে এই হার ছিল ৪৭ শতাংশ। এনএফএইচএস-৪-এ (২০১৫-১৬ সালে সংগৃহীত তথ্য) তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২.২ শতাংশ। আর সাম্প্রতিক এনএফএইচএস-৫ এই হার একেবারে ৭০ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। বয়ঃসন্ধিকালীন রক্তাল্পতা একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। একদিকে তা যেমন আগামী দিনের নারীদের স্বাস্থ্য কেমন দাঁড়াবে তা চিহ্নিত করে, আরেকদিকে তা আগামী দিনের শিশু তথা ভবিষ্যতের নাগরিকদের স্বাস্থ্যও নির্ধারণ করে। এই সূচকে প্রতিফলিত হয় মেয়েদের অপুষ্টি, আবার প্রতিফলিত হয় প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিরোধী ব্যবস্থা (যেমন আয়রন-ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট সাপ্লাই, বা উপযুক্ত ক্ষেত্রে কৃমির ওষুধ সাপ্লাই) যথাযথভাবে নেওয়া হচ্ছে কিনা, অর্থাৎ জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার ঠিকঠাক কিনা তাও যাচাই যায়।

ছানি-কাটানোর অপারেশন

রাজ্যে সরকারি পরিকাঠামোয় ছানি-কাটানোর অপারেশনের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে ২০১১-১২ সালের পর থেকেই। অন্ধত্ব নিবারণের জন্য একটি ন্যাশনাল প্রোগ্রাম রয়েছে প্রতি রাজ্যে ছানি-কাটানোর অপারেশনের জন্য নির্দিষ্ট টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করে থাকে। নতুন শতাব্দীর প্রথম দশ বছরে আমাদের রাজ্য লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছিই ছিল। সর্বনিম্ন পারফরম্যান্স যে-বছর, সে-বছর লক্ষ্যমাত্রার চুরাশি শতাংশ পূরণ হয়েছিল। সেরা পারফরম্যান্সের বছরে তা লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে পৌঁছে ছিল ১৩০ শতাংশে (এক্ষেত্রেও, লক্ষ্যমাত্রার বেশি অপারেশনের খরচ, কেন্দ্রীয় সরকারই দেয়)। কিন্তু ২০১১-১২ সাল থেকে কমতে কমতে ২০১৬-১৭ সালে রাজ্যে ছানি-কাটানোর অপারেশনের সংখ্যা গিয়ে নেমেছে লক্ষ্যমাত্রার ৪৭ শতাংশে।

সরকারি স্বাস্থ্য পরিচালনায় বেসরকারি দৃষ্টিভঙ্গি

বেসরকারি পরামর্শক্রমে সরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন প্রকল্প শুরু হয়ে গেল। কিন্তু সরকারের বেসরকারি উপদেষ্টারা নিজেদের প্রাইভেট হাসপাতালে সাপে-কাটা, অপুষ্টি, পেট-খারাপ ইত্যাদির চিকিৎসা করেন না; সুতরাং তাঁদের মনে হল, গ্রামেগঞ্জে গরিবগুর্বোদের জীবনে অভাব যদি কিছু থাকে, তা হল হাইটেক চিকিৎসা ও 'স্পেশালিষ্ট'-এর। দিকে দিকে গজিয়ে উঠল মস্ত বড়ো বড়ো বিল্ডিং— সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতাল স্পেশালিষ্ট নিয়োগ না-করেই। ২০২১ সালের বাজেট যদি দেখি, সেখানে স্বাস্থ্যখাতে রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেছেন মোট ১৬,৩৬৮ কোটি টাকা। তার

মধ্যে ১০,৯২২ কোটি টাকা বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের খাতে বরাদ্দ, ৫,২৪৬ কোটি টাকা প্রাথমিক স্বাস্থ্যখাতে (যদিও সকলেই জানেন যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যখাতে খরচ বাড়ালে দীর্ঘমেয়াদে বড়ো অসুখগুলোর চিকিৎসাখাতে ব্যয় কমানো সম্ভব)।

এর পাশাপাশি ২,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের জন্য এবং বাজেটের বাইরে আরও ১,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ সরকারি কর্মী ও অবসরপ্রাপ্তদের চিকিৎসার বিল মেটানোর জন্য। বরাদ্দ যাই থাক, ওই অর্থ বর্ষেই স্বাস্থ্যসাথী বাবদ খরচ হয়েছিল ২,২৬৩ কোটি টাকা। পরের বছর খরচ হয়েছিল ২,৬০০ কোটি টাকারও বেশি, তার পরের বছর প্রায় ২৭০০ কোটি টাকা। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, প্রকল্পের শুরু থেকে ধরলে গত বছরের শেষ অবদি রাজ্য সরকার স্রেফ স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পেই খরচ করেছেন তের হাজার কোটি টাকারও বেশি। প্রায় নিশ্চিত হয়েই অনুমান করা যায় যে, এই তেরো হাজার কোটি টাকার বেশির ভাগটাই পৌঁছেছে বেসরকারি হাসপাতালের কোষাগারে। যদিও টাকাটা জনসাধারণের করের টাকা!

যাঁদের কঠিন অসুখের চিকিৎসা হয়েছে স্বাস্থ্যসাথী স্কিমে এবং অনেকেরই সাধারণ অসুখ-বিসুখের চিকিৎসাও হয়েছে (যা এমনকি ব্লক লেভেলের হাসপাতালেও হওয়া সম্ভব ছিল, মেডিকেল কলেজগুলোতে তো বটেই) তাঁরা উপকৃত হয়েছেন, অবশ্যই। কিন্তু মাথায় রাখা জরুরি, এই খরচটা স্রেফ এককালীন বিল মেটানো গোত্রের খরচ, যার কোনও দীর্ঘমেয়াদি উপকারিতা নেই। এমনকি যাঁর চিকিৎসা হল তিনিও যদি পরের বার অসুস্থ হন, সে-ক্ষেত্রেও সরকার নতুন করে খরচ না-করে তাঁর দ্বিতীয় অসুস্থতার চিকিৎসা করাতে পারবেন না। অর্থাৎ এই বিপুল বিল-মেটানো, তা স্রেফ খরচই। অথচ টাকাটা যদি সরকারি স্বাস্থ্য-পরিকাঠামো উন্নত করার

কাজে ব্যয়িত হত, তাহলে তার উপকার পেতে পারতেন অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ এবং পেতে পারতেন বছরের পর বছর ধরে।

স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ

রাজ্য সরকার স্বাস্থ্যখাতে প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করে না। সর্বশেষ জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি অনুযায়ী, রাজ্য বাজেটের আট শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হওয়ার কথা। সেখানে আমাদের রাজ্য বরাদ্দ করে এর অর্ধেকের একটু বেশি— বাজেটের সাড়ে চার শতাংশ, যা কেরালা, তামিলনাড়ু, রাজস্থান গোত্রের রাজ্যগুলোর থেকে পিছিয়ে তো বটেই, এমনকি জাতীয় গড়ের থেকে পিছিয়ে। ফলে একদিকে স্বল্প বরাদ্দ এবং সেই স্বল্প বরাদ্দের অধিকাংশই হাইটেক চিকিৎসার পেছনে খরচ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকে অবহেলা করা হচ্ছে। আবার ওই স্বল্প বরাদ্দটুকুর মধ্যেও একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ সরকারি স্বাস্থ্যবীমার মাধ্যমে বেসরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবসাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলার কাজে 'সাইফনিং' হয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে যোগ করুন সরকারের তরফে, পরোক্ষ হলেও, নিরন্তর জারি রাখা বার্তা— বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসাই সেরা এবং জনসাধারণের কাছে লাগাতার এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সরকারই যাতে সরকারি হাসপাতালগুলোও পাঁচতারা কর্পোরেট হাসপাতালের মতো হয়ে যায়। যতদিন অবদি তা সম্ভব না-হচ্ছে, ততদিন জনগণ যেন একটু কষ্ট করে প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে নেন, স্বাস্থ্যসাথী আছে যখন তখন বিল সরকার মিটিয়ে দেবে। পরিস্থিতি সে-দিকে যাচ্ছে যখন ক্ষয়িষ্ণু সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গিয়ে পাব্লিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ, ওরফে পিপিপি মডেলে, সরকারি হাসপাতাল বেসরকারি তত্ত্বাবধানে চালাতে দিলেও

জনসাধারণের সম্বিত ফিরবে না কেন-না, স্বাস্থ্যসাথীর জোরে সবার গন্তব্য প্রাইভেট হাসপাতাল।

‘সেবাশ্রয়’ ক্যাম্প

সরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার রাশ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর নিজের হাতে থাকা সত্ত্বেও সরকারে আসীন শাসক দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা তাঁর নিজের লোকসভা কেন্দ্রে চালু করেন ‘সেবাশ্রয়’ প্রকল্প। সরকারি স্বাস্থ্য-কাঠামোর বাইরে অসরকারি হেলথ ক্যাম্প— যাতে নাকি রোগীর ঢল নামে— কেন এই উদ্যোগের প্রয়োজন হল? এমন ‘সেবাশ্রয়’ সর্বসাধারণের কাছে ঠিক কোন্ বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য আয়োজিত হল?

সবার নাগালের মধ্যে গ্রহণযোগ্য একটি সরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা নির্মাণের লক্ষ্যে আমরা এগোচ্ছিলাম। দেশের একটি অঙ্গরাজ্যের শাসনে থেকে বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলা সম্ভব না-হলেও চোখে পড়ার মতো উন্নতি করার জন্য একটানা চৌঁত্রিশ বছর সময় হিসেবে খুব কম নয়। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার বেশ কিছুদূর এগোলেও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার উন্নতির ব্যাপারে যতখানি প্রত্যাশিত ছিল, তার কাছে পৌঁছাতে পারেনি।

বর্তমান সরকার খুব পরিকল্পিতভাবেই জনস্বাস্থ্যে আমাদের যেটুকু অর্জন তা ধ্বংস করে ফেলছে। বেসরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার মডেল শিরোধার্য করে সরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাকে মুনাফাকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার অনুসারী করে তুলছে এবং পুরোটাই হচ্ছে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে।

দিশা

হওয়ার কথা ছিল কর্মসংস্থান। হচ্ছে ধর্মস্থান। হওয়ার কথা ছিল তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক। হচ্ছে মহাকাল মন্দির। সরকারি উদ্যোগে। সরকারি খরচে। মন্দির-মসজিদ আগেও ছিল। পরেও থাকবে। কিন্তু রাজনীতি, রাষ্ট্র এনিয়ে কেন মাথা ঘামাবে? বাংলায় তো হাজারো সমস্যা। বেকারত্ব-দারিদ্র্য-ক্ষুধা থেকে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আবাসন-নারী নিরাপত্তা। এমনসব জরুরি সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সমস্যা মোকাবিলা করাই রাজনীতি, রাষ্ট্রের কাজ।

অথচ, আজকের বাংলার রাজনীতি মানে, বিজেপি-র হিন্দুত্বের রাজনীতির পালটা তৃণমূলের হিন্দুয়ানি রাজনীতি। কে বলবে রামমন্দির রাজনীতিকে প্রতিহত করার পন্থা দশটা জগন্নাথ মন্দির বা মহাকাল মন্দির তৈরি করা নয়।

কেউ যদি মনে করেন, এর ফলে বিজেপি'র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির পালের হাওয়া তৃণমূল কেড়ে নিতে সফল হবে এবং বিজেপি নির্বাচনে ব্যর্থ হবে, তবে তিনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। কারণ, রাজনীতির পরিসরে এই ধর্মীয় ভাবনাকে টেনে আনাই হিন্দু, মুসলিম সব মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা। মমতা ব্যানার্জি কেবল তাদের সেই আকাঙ্ক্ষাটুকুই পূরণ করছেন। উগ্র দক্ষিণপন্থা আসলে নিজের জন্য জমি চাষ করিয়ে নিতে চাইছে। জমিকে উর্বর করতে চাইছে।

দেড়দশক আগেও বাংলার বুকে এসব কল্পনাও করা যেত না। সেদিনের কর্মকাণ্ড যদি বাস্তবায়িত হতো, তবে আজ বাংলার এই অবস্থা হতো না।

বামপন্থীরা ছোট্ট জমিতে ছিল। কিন্তু ছিল শক্ত জমি। বিজেপি দাঁত ফোটাতে পারেনি। কোনও পঞ্চায়েতে এক-আধটা আসন জিতলেও, খবর হতো। গোটা দেশ বাংলাকে দেখত অন্য চোখে। ভূমিসংস্কার, পঞ্চায়েত— গরিবের হাতে জমি, গরিবের হাতে গ্রামের সরকার। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। জমিতে সেচের জল— এক-ফসলি থেকে তিন-ফসলি জমি। শিক্ষার প্রসার। কৃষির সাফল্যকে সংহত করে শিল্পায়নের ভিত গড়ে তোলা— রাজ্যে বিতর্ক-আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাংলার উন্নয়ন, মানুষের উন্নয়ন।

নভেম্বর, ২০০০। ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বাংলায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি পর্যায় প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ভূমি সংস্কার এবং অপারেশন বর্গা সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত হয়েছে। কৃষি থেকে উৎপাদন ও উদ্বৃত্তের অসাধারণ বৃদ্ধি দেখছে রাজ্য। যা গ্রামীণ যুবকদের কৃষিজমিতে নির্ভর করার বাধ্যবাধকথা থেকে মুক্ত করে। সাফল্য সবসময়ই কিছু নতুন চ্যালেঞ্জের জন্ম দেয়। এবং দিয়েছিল-ও। গ্রাম-শহরের শিক্ষিত তরুণরা ট্র্যাডিশানাল কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন না। থাকার কথাও নয়। রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশ তাদের চাহিদা মতো কাজ দিতে পারছিল না। বাংলার যুবসমাজ, যারা তুলনামূলকভাবে শিক্ষায় এগিয়ে, তাদের জন্য কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করাই ছিল চ্যালেঞ্জ। ছিল প্রগতির স্লোগান: গ্রাম থেকে শহর, উন্নত কৃষির উপর দাঁড়িয়ে শিল্প। কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ। একমাত্র উপায় ছিল দ্রুত শিল্পায়ন। এ ছিল সময়ের চাহিদা। সেই সুযোগ না থাকার কারণেই বাংলা উজাড় করে শ্রমিকরা এখন ভিনরাজ্যে। সেদিনের সেই দৃষ্টিভঙ্গি আজ তাই অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক।

সেদিন উগ্র দক্ষিণ, মধ্য-দক্ষিণ থেকে অতি বাম, মাওবাদীরা সবাই ছিল একজোট। সকলের নিশানায় ছিল বামফ্রন্ট। রাজ্য সরকার নাকি জমি কেড়ে নিচ্ছে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঘোষণা করেছিলেন, শিল্পের জন্য জমি লাগবে রাজ্যের মোট জমির মাত্র ১ শতাংশ। তবুও। ওয়াশিংটনের ব্লু-প্রিন্টে প্রচারের আলোয় চাপা পড়ে গিয়েছিল: ২০০৬-২০১০, শেষ চারবছরেও বিলি করা হয়েছে ১৬ হাজার ৭০০ একর জমির পাট্টা। শুধু এই পরিমাণ জমি অন্যত্র কুড়ি বছরেও বিলি হয়েছে কিনা সন্দেহ! এমনকি, ২০১০-১১ সালেও বিলি করা হয়েছে আরও ৬ হাজার একর।

তবু বিতর্ক সীমাবদ্ধ ছিল কেবল রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে। ছিল গণতন্ত্র। মানুষের জীবনজীবিকা ও কথা বলার অধিকার। সরকারকে সমালোচনার গণতন্ত্র। ধর্মতলার ব্যস্ত রাস্তায় মাচা বেধে ছাব্বিশ দিন সরকার-বিরোধী বিক্ষোভের নামে নাটক, আরএসএস-বিজেপি'র প্রকাশ্যে মদত। পুলিশ যায়নি। গণতন্ত্রের 'মন্দির' বিধানসভা ভাঙচুর। ভিডিও ফুটেজ থাকলেও কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। মাচা ভেঙে দিয়ে সিঙ্গুরে কারখানা করেনি। বিধানসভায় দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন থাকলেও, করেনি। সেদিন এমনই ছিল গণতন্ত্র।

বামফ্রন্টের সময়ই বিরোধী দলের নেতাকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদা। সুস্থ বিতর্কের দরজা হাট করে খোলা। বিধানসভায় আলোচনার অর্ধেক সময় বিরোধীদের জন্য বরাদ্দ। দেশের মধ্যে ছিল এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। দেশের মধ্যে এরাজ্যেই প্রথম লোকায়ুক্ত গঠন। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ এর আওতায়।

সেসময় পঞ্চায়েত তো বটেই, অনেক পঞ্চায়েত সমিতি এমনকি জেলা পরিষদ পর্যন্ত চালিয়েছে বিরোধীরা। কখনও মুর্শিদাবাদ, কখনও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কিংবা পূর্ব মেদিনীপুর। বামফ্রন্ট কখনও কোনওদিন সেগুলিকে ভাঙার চেষ্টা করেনি। সিপিআই(এম) কখনও বিরোধীদের ভোটে জেতা কোনও সদস্যকে কৌশলে ভাঙিয়ে আনার

চেষ্টা করেনি। বাকি দেশের মতো ছিল না দল-বদলের ঘটনা। ছিল দিন-বদলের অনুশীলন।

কখনও মন্দির-মসজিদ ইস্যু হয়নি। আজ, তৃণমূলের শাসনে সব কেমন বেমালুম উধাও। নিজের চেনা জায়গা নিজেরই কাছেই কেমন যেন অচেনা।

স্বাভাবিক। তখন তৃণমূল ছিল না। তৃণমূলের হাত ধরে আসেনি বিজেপি-ও। ২০১১, বিজেপি একটি আসন-ও পায়নি। সমর্থনের হার ৫ শতাংশও ছিল না। এখন বিধানসভায় ৭৭, সমর্থনের হার বেড়ে ৩৮.১ শতাংশ। দেড় দশকে পশ্চিমবঙ্গে আরএসএসের শাখার সংখ্যা বেড়েছে পাঁচ-গুণেরও বেশি! লক্ষ্য: চলতি বছরে, সংগঠনের শতবর্ষে বিধানসভা ভোটের আগে এই সংখ্যা অন্তত ৮,০০০ করে ফেলা। রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে তারা খুলতে চায় শাখা। মানে প্রতিষ্ঠার পঁচাশি বছরে যা পারেনি, গত পনরো বছরে তার অনেকটা করতে পেরেছে।

আজ রক্তশূন্য গ্রাম। কৃষক পাচ্ছে না ফসলের দাম। লুট হয়ে যাচ্ছে পাট্টা জমি, ভেড়ি। দিতে হচ্ছে জরিমানা। গ্রামোন্নয়নে লুট আর দুর্নীতি। থানায় আত্মহত্যার রেকর্ড-ও নেই। নেই রেগা-র কাজও। একশ দিনের কাজ উধাও। বহুদিন। একদিকে আরাবল্লী বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে দেউচা-পাচামি। আক্রান্ত জল-জমি-জঙ্গল। গ্রাম-শহর উজাড় করে মানুষ তাই ভিন রাজ্যে। কাজের খোঁজে। নিত্যদিনের পত্রিকায় তাঁদের কারও না কারও মৃত্যুর খবর। তাঁরা ঘরে ফেরেন। তবে লাশ হয়ে। তবু যান। যেতে বাধ্য হন। পেটের টানে। গ্রামবাংলা আজ মাইক্রোফিনান্সের মৃত্যুফাঁদে। গ্রামের ভাষায়, বৌ-বন্ধকী ঋণ! কামদুনি, হাসখালি থেকে অভয়া। নেই মেয়েদের নিরাপত্তা। সাত থেকে সত্তর— কেউই নিরাপদ নয়। গ্রাম-শহর থেকে কলকাতা— কোথাও না, কখনও না। এক নৈরাজ্যের রাজ্য।

দেশের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে রাজ্যের জিডিপি। পিছিয়ে পড়ছে মাথাপিছু আয়েও। রাজ্যওয়ারি মাথাপিছু নিট আয় দেখলে পশ্চিমবঙ্গ আসলেই একটি দরিদ্র রাজ্য। তালিকায় নিচের দিক থেকে সাতে। এমনকি ওড়িশা, ত্রিপুরার মাথাপিছু গড় আয় পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বেশি। নেই নতুন কোনও কলকারখানা। উলটে বন্ধ হচ্ছে চালু কারখানা। আকাশ ছুঁয়েছে রাজ্যর মাথাপিছু ঋণ। ধার শোধ করতেই সরকারের খরচ হবে ৮০ হাজার কোটি টাকার বেশি। পান্তাই নেই, নুন আনার প্রশ্ন! নতুন রাস্তা, স্কুল-কলেজ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে হাসপাতাল নির্মাণ তাই অবান্তর প্রশ্ন।

এখান থেকেই ঘুরে দাঁড়াতে হবে। বামপন্থীরা হেরেছে ঠিকই। কিন্তু হারিয়ে যাইনি। হাম হারে তো কেয়া, ময়দান সে ভাগে তো নাহি, রোয়ে তো নাহি, ধান্দলি তো নাহি কী (মুন্সী প্রেমচন্দ)। আমরা হেরেছি ঠিকই, ময়দান ছেড়ে পালিয়ে তো যাইনি, কাঁদতে বসেও যাইনি, প্রতারণাও করিনি।

জরুরি তাই রেজিসটেন্স। প্রতিরোধ। একইসঙ্গে একটি জোরালো কামব্যাক। বামপন্থার দুরন্ত প্রত্যাবর্তন।

এই বাংলাকে বাঁচাতে হবে। বাঁচাতেই হবে। বাম বিকল্পের মূল কথাই তাই: বাংলার পুনরুত্থান, রিসারজেন্স অব বেঙ্গল।

বাংলার ভিশন: বিকল্পের মূল ভিত্তি হবে: ধর্মীয় মেরুকরণ-মুক্ত বাংলা। মূল ইস্যু: রুটি-রুজি। সবচেয়ে গরিব-প্রান্তিক, মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন। রাজ্যে শান্তি, গণতন্ত্র ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা। ফ্র্যাঞ্চাইজি অর্থনীতি, তোলাবাজ প্রশাসন নয়। একটি স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন। দুর্নীতি, অপচয় কমিয়ে পরিকাঠামো নির্মাণ। স্কুল-কলেজ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র-হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন। রাস্তাঘাট-পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থার প্রসার। জমিতে সেচের জলের সম্প্রসারণ। সেতু, উড়ালপুল নির্মাণ।

লক্ষ্য হবে গ্রামোন্নয়ন। গ্রামের বাজারের বিস্তার। কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি। গ্রামে কাজের নিশ্চয়তা। বছরে ১২০ দিনের কাজের গ্যারান্টি। আবাস যোজনায় ঘর নিশ্চিত করা। গ্রামীণ এলাকায় প্রতিটি সংযোগকারী রাস্তা পাকা করা। ফসলের অভাবী বিক্রি নয়। ফড়ে-দালালদের দৌরাত্ম্য রুখে ফসলের ন্যায্য লাভজনক দাম। প্রতি পঞ্চায়েতে কৃষক সমবায়। যেখান থেকে সরাসরি কেনা হবে ফসল। দুর্নীতি-মুক্ত করে চাঙ্গা করা হবে গ্রামীণ সমবায়কে। ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মকুব করা হবে। ১৭টি প্রধান ফসলের জন্য 'ন্যূনতম সহায়ক মূল্য' নির্ধারণ ও সরকারি ক্রয়ের ব্যবস্থা। কৃষকদের জন্য থাকবে সরাসরি আর্থিক সহায়তা। নব্য মহাজন— মাইক্রোফিনান্স-মুক্ত গ্রাম। মাইক্রোফিন্যান্স সংস্থাগুলোর চড়া সুদের হার নিয়ন্ত্রণে কড়া আইন আনা হবে। চালু করা হবে কঠোর তদারকি ব্যবস্থা। গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে সরকারি ব্যাংক থেকে নামমাত্র সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা হবে। যাতে বেসরকারি ঋণের জাল থেকে তারা মুক্তি পান।

সেইসঙ্গে শিল্পে পুনরুজ্জীবন। শ্রম-নিবিড় শিল্পে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব। যা সরাসরি তৈরি করবে লক্ষাধিক কর্মসংস্থান। সঙ্গে আয়ের নিরাপত্তা। জেলার বৈশিষ্ট্য ধরে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং বিকাশ। স্থানীয় স্তরে ছোট শিল্প স্থাপনে সরকারি সহায়তা ও ঋণের সহজলভ্যতা। রাজ্যে বড়ো বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া কলকারখানা পুনরুজ্জীবিত করার পরিকল্পনা।

সর্বাধিক গুরুত্ব: কর্মসংস্থান। গ্রাম-শহরে কাজের গ্যারান্টি। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ম করে বছর-বছর নিয়োগ। সেইসঙ্গে সরকারি দপ্তরে দ্রুত শূন্যপদে নিয়োগ। যেমন হতো দেড়দশক আগে। স্বচ্ছতার সঙ্গে। অস্থায়ী কর্মীদের জন্য থাকবে নির্দিষ্ট কাজের সময়, নিশ্চিত করা হবে সামাজিক সুরক্ষা এবং বিমা।

শ্রমিক-কর্মচারীর অধিকার থাকবে সুরক্ষিত। ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারে থাকবে নিশ্চয়তা। সরকার থাকবে শ্রমিকের পাশে। গিগ শ্রমিক-সহ অন্যান্য অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য থাকবে বীমা-সহ সামাজিক সুরক্ষা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমকাজে সমমজুরি। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য বাজারের মূল্যবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করা হবে ন্যূনতম মাসিক মজুরি। এবং তা কঠোরভাবে কার্যকর করা হবে। ভিনরাজ্যে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য বিশেষ দুর্ঘটনা বিমা এবং তাদের পরিবারের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিষেবা নিশ্চিত করা হবে।

ঢেলে সাজানো হবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নৈরাজ্য, গুণ্ডামি, তোলাবাজি দমন করে ফেরানো হবে আদর্শ-সুস্থ পরিবেশ। সর্বত্র গড়ে তোলা হবে স্মার্ট ক্লাসরুম, উন্নত-আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা। স্কুল ও কলেজে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়াকে করা হবে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত। এবং করা হবে নিয়মিত। পূরণ করা হবে শূন্যপদ। পড়াশোনার পাশাপাশি কারিগরি ও হাতে-কলমে কাজের প্রশিক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে পাঠ্যক্রমে।

উন্নত করে তোলা হবে স্বাস্থ্য-পরিকাঠামো। স্বাস্থ্য-পরিষেবা। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আধুনিকীকরণের সঙ্গেই স্বচ্ছতার সঙ্গে চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ। গ্রাম বা ব্লক স্তরের হাসপাতালেই উন্নত চিকিৎসা ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিশ্চিত করা হবে, যাতে বন্ধ হয় 'রেফার কালচার'। সমস্ত সরকারি হাসপাতালে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ এবং সব ধরনের ল্যাবরেটরি পরীক্ষা হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

মহিলাদের নিরাপত্তার প্রশ্নে নেওয়া হবে জিরো-টলারেন্স। বাড়ানো হবে মহিলা ভাতা। কারণ বন্ধ হবে দুর্নীতি। রিলিফ বা অনুদান নয়। গণ্য করা হবে রাইট বা অধিকার হিসেবে। ডোল-পলিটিক্স নয়। হকের রাজনীতি। মহিলাদের আর্থিক স্বাধীনতার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে সরকারি

গ্যারান্টিতে সম্পূর্ণ সুদমুক্ত ঋণের সুবিধা দেওয়া হবে। মহিলাদের সুরক্ষায় থাকবে বিশেষ পিঙ্ক পুলিশ স্কোয়াড।

গঙ্গা ও পদ্মা পাড়ের নদী ভাঙনপ্রবণ এলাকায় নেওয়া হবে স্থায়ী বৈজ্ঞানিক সমাধান। বায়ু দূষণ রোধে 'গ্রিন বেল্ট' তৈরি এবং নির্মাণের ধুলোবালি নিয়ন্ত্রণে আনা হবে কড়া আইন। পরিবেশ ধ্বংসকারী অবৈধ বালিখাদান ও পাহাড় কাটা বন্ধে নেওয়া হবে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা। রক্ষা করা হবে অরণ্য।

টোটো রেজিস্ট্রেশনের নামে বেআইনি তোলাবাজি নয়। সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ করে চালু হবে সহজ অনলাইন রেজিস্ট্রেশন। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে নিকটবর্তী শহর বা রেলস্টেশন পর্যন্ত নিয়মিত সরকারি বাস সার্ভিস চালু। বাস, লরি ও অটো চালকদের জন্য বিশেষ বিমা এবং তাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা সহায়তার ব্যবস্থা।

বাংলা হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক প্রবেশদ্বার, যেখানে প্রতিটি পরিবারে থাকবে একটি স্থায়ী কাজের গ্যারান্টি। এরাজ্যের আত্মসম্মান, মর্যাদা ফিরিয়ে আনা হবে এই বিকল্পের অঙ্গীকার।

স্কুল-কলেজ থেকে পঞ্চায়েত-পৌরসভায় সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন। ফেরানো হবে গণতন্ত্র। থাকবে কথা বলার অধিকার। মানুষের মতামত নিয়ে চলবে সরকার।

মার্কসবাদী পথ

৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬

+918777648148

www.marxbadipath.org

marxbadipath.22@gmail.com